কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 16 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

হাওরাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষায় শুভঙ্করের ফাঁকি

- বছরের সাত মাসই কার্যত পড়ালেখা হয় না
- যাদের নৌকা আছে তারাই মাঝেমধ্যে স্কুলে যায়
- ইচ্ছেমতো স্কুলে আসেন আবার যান শিক্ষকরা
- কাগজে-কলমে ঝরে পড়ার সংখ্যা কমলেও, বাস্তবে বাড়ছে
- নামেমাত্র তদারকি শিক্ষা প্রশাসনের

শরীফুল আলম সুমন
সুনামগঞ্জ থেকে ফিরে ▶

জুলাই থেকে ডিসেম্বর—ছয় মাসই হাওরাঞ্চলে থইথই পানি। নেই কোনো রাস্তা, সব পরিবারে নৌকাও নেই। যাদের আছে তারা সেটা দিয়ে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহের কাজেই ব্যস্ত। তাই শুকনো মৌসুম ছাড়া শিশুদের স্কুলে যাওয়ার সুযোগও খুব কম। আর এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইরি ধান কাটা ও মাড়াইয়ের মৌসুম। এই একটি মাস হাওরাঞ্চলের প্রতিটি পরিবারের ছেলে থেকে বুড়ো সবাই থাকে ধান কাটায় ব্যস্ত। কারণ বছরে একবারই ফসল হয় এ অঞ্চলে। এ সময়েও ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আর এলাকা পানিতে তলিয়ে থাকায় সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলোই ব্যবহৃত হয় ধান মাড়াইয়ের কাজে। ফলে বছরের সাত মাসই হাওরাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কার্যত লেখাপড়া হয় না। আর যতটুকুই বা হয় সেখানেও শুভঙ্করের ফাঁকি লক্ষ করা গেছে। গত বুধবার সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলার বেহেলী ইউনিয়নের কয়েকটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে এমন তথ্যই পাওয়া গেছে।

জামালগঞ্জের বেহেলী ইউনিয়নে অবস্থিত হরিণাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যা ২০০। বুধবার এই স্কুলে গিয়ে দেখা যায়, প্রথম শ্রেণির ৫৯ শিক্ষার্থীর মধ্যে উপস্থিত ৩০ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির ৫৪ জনের মধ্যে উপস্থিত ১৬, তৃতীয় শ্রেণির ৪১ জনের মধ্যে উপস্থিত ১৩, চতুর্থ শ্রেণির ৩১ জনের মধ্যে উপস্থিত সাত এবং পঞ্চম শ্রেণির ১৫ শিক্ষার্থীর মধ্যে উপস্থিত মাত্র পাঁচজন। বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষকের পদ থাকলেও আছেন মাত্র দুজন। তাই অস্থায়ীভাবে দৈনিক ভিত্তিতে একজন প্যারা শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার দুপুর পৌনে ২টার দিকে সেই প্যারা শিক্ষক আবুল কাশেম পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিচ্ছিলেন। দপ্তরি কাম নাইটগার্ড মো. আয়নাল হোসেন ক্লাস নিচ্ছিলেন তৃতীয় শ্রেণির। আর চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে। যদিও স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা তুলি রানী সরকার বিদ্যালয়ে উপস্থিত। তবে অন্য সহকারী শিক্ষক নুসরাত জাহান রুমি ছুটিতে বলে জানান প্রধান শিক্ষিকা। তিনি ছুটির দরখাস্ত দেখাতে পারলেও তাতে অনুমোদন ছিল না।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তুলি রানী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের স্কুলের দুটি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য। কিছুদিন আগে আমি একাই ছিলাম। কোনো যোগাযোগব্যবস্থা না থাকায় শিশুরা স্কুলে আসে না। হরিণাকান্দি পূর্ব ও পশ্চিমপাড়ার সংযোগে একটি সাঁকো থাকায় এ এলাকার শিশুরাই শুধু স্কুলে আসে।'

তবে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য আবদুল বাছেত কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সব শিক্ষকই থাকেন জামালগঞ্জ সদরে। তাঁদের আসতে আসতে প্রায় ১১টা বেজে যায়। আবার আবহাওয়া একটু খারাপ থাকলে স্কুলই খোলা হয় না। তাই অভিভাবকরাও বাচ্চাদের পাঠাতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন। এত কষ্ট করে যাবে অথচ দেখা যাবে স্কুলই বন্ধ।'

বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. রাহিম বলল, 'স্কুল মাঝেমধ্যে বন্ধ থাকে, আবার মাঝেমধ্যে খোলা থাকে। আমাদের বাড়ি স্কুলের কাছেই, তবে সাঁকো পার হয়ে আসতে হয়। এক হাতে বই নিয়ে অন্য হাতে সাঁকো পার হতে খুবই ভয় লাগে।' তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী রুবাইয়া আক্তার বলল, 'বৃষ্টি হলে ভয় লাগে তাই রোদ থাকলে স্কুলে আসি।'

হাওরিয়া আলীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা সম্পূর্ণই ভিন্ন। কারণ এ এলাকার কয়েকটি বাড়ি নিয়ে একেকটি পাড়া। সেই পাড়ার চারপাশে থইথই পানি। আর স্কুলটি সম্পূর্ণ বাইরে। এর সঙ্গে কোনো বাড়িঘর নেই। নৌকা ছাড়া এই স্কুলে আসার কোনো উপায় নেই। তাই এ স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা একেবারেই কম। মাত্র ৭৭ জন শিক্ষার্থী এই স্কুলে। তবে গত বুধবার দুপুরে এই স্কুলে গিয়ে দেখা যায়, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি ছুটি হয়ে গেছে। তৃতীয় শ্রেণিতে উপস্থিত ১৩ জন, চতুর্থ শ্রেণিতে ১০ ও পঞ্চম শ্রেণিতে পাঁচ শিক্ষার্থী উপস্থিত রয়েছে। আর তিনজন শিক্ষকের মধ্যে সহকারী শিক্ষক সাজাহান শাহ উপস্থিত নেই। প্রধান শিক্ষক তাঁর ছুটির আবেদন দেখাতে পারলেও তাতে কোনো অনুমোদন ছিল না।

গত বুধবার বিকেলে রাধানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি আগেই ছুটি হয়ে গেছে। এখন বাকি তিনটি শ্রেণির ক্লাস চলছে। কিন্তু স্কুলের নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে মাত্র তিনটি কক্ষ। একটি কক্ষে শিক্ষকদের বসার স্থান। আর অন্য কক্ষ দুটিতে বাকি তিনটি শ্রেণির ক্লাস চলছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সোহেলা খানম তালুকদার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পানির মধ্যে বাচ্চারা কিভাবে আসবে? তাই উপস্থিতি কম থাকে। বাচ্চারা যারা আসে তাদের বিকেল পর্যন্ত থাকতে হয়। অথচ আমাদের স্কুলগুলোতে ফিডিং কার্যক্রম নেই। এই এলাকার স্কুলগুলোর জন্য বিশেষ নজর দেওয়া উচিত।'

স্কুলগুলোতে ঘুরে বেশ কিছু ফাঁকি লক্ষ করা যায়। আর উপজেলা শিক্ষা প্রশাসনও জেনেশুনে সেই ফাঁকিকে মদদ দিয়ে চলছে। প্রতিটি স্কুলেই প্রতিদিন কোনো না কোনো শিক্ষক অনুপস্থিত থাকেন। তবে তাঁরা একটি ছুটির আবেদন রেখে যান। কেউ পরিদর্শনে এলে তা দেখানো হয়। আর কেউ না এলে শিক্ষকরা ফিরে খাতায় স্বাক্ষর করেন। ছুটির প্রয়োজন হয় না। এভাবে পর্যায়ক্রমে আঁতাতের মাধ্যমে সব শিক্ষকই স্কুল বাদ দেন।

জামালগঞ্জ উপজেলায় ১২৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এতে ৬০০ শিক্ষকের পদ থাকলেও আছেন ৪৮৫ জন। তবে অনেক শিক্ষকই নিয়মিত স্কুলে যান না। তাঁরা এলাকার কোনো লোককে মাসে এক থেকে দুই হাজার টাকার বিনিময়ে স্কুলে পড়ানোর দায়িত্ব দেন।

তবে জামালগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শফি কামাল নানা অভিযোগের কথা স্বীকার করে এ অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে কয়েকটি সুপারিশের কথাও বললেন। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'হাওরাঞ্চল পাহাড়ি এলাকার চেয়েও দুর্গম। তাই এখানে সরকারের পৃথক নীতিমালা থাকা জরুরি।'

সারা দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার ২১ শতাংশ হলেও এ দুর্গম এলাকায় তা বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জামালগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, সেখানে ঝরে পড়ার হার ১৪.৬ শতাংশ। অথচ তিনটি স্কুল ঘুরে এর বিপরীত চিত্র লক্ষ করা যায়। ৩ স্কুলগুলোতে প্রথম শ্রেণিতে ১৭৪ শিক্ষার্থী থাকলেও পঞ্চম শ্রেণিতে আছে মাত্র ৪৪ জন। সেই হিসাবে ঝরে পড়ার হার প্রায় ৭৪.৭১ শতাংশ। আর এই এলাকার শিক্ষকরা নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত না থাকলেও শিক্ষা প্রশাসন তেমন কোনো ব্যবস্থা নেয় না।

জামালগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নুরুল আলম ভূঁঞা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এ উপজেলার বিদ্যালয়গুলোতে একদিকে পদ কম,' আবার বেশ কিছু পদ শূন্যও রয়েছে। শিক্ষকরা ঠিকমতো ক্লাস না করায় আমরা প্রায়ই নানা ব্যবস্থা নিই। কিন্তু শিক্ষকরা তাতেও সাবধান হন না।'

সুনামগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হযরত আলী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা হাওরাঞ্চলের প্রতিটি স্কুলের জন্যই একটি করে নৌকা চেয়েছি। আর গ্রীষ্মকালীন ছুটি বাদ দিয়ে তা অন্য সময় দেওয়ার কথাও বলেছি। কিন্তু সব প্রস্তাবনাই আটকে রয়েছে। আর পুরুষ শিক্ষকের পদ খালি থাকলে মহিলা দিয়েও পূরণ করা যায়; কিন্তু মহিলা শিক্ষকের পদ খালি থাকলে তা পুরুষ শিক্ষক দিয়ে পূরণ করার উপায় নেই। আসলে এ এলাকার জন্য পুরুষ শিক্ষকের বিশেষ দরকার।'

এসব বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কালের কণ্ঠকে বলেন, 'হাওরাঞ্চলে স্কুলগুলোর সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের উপায়গুলো নিয়ে আপনারা লিখুন। তাহলে হয়তো আমরাও তা সমাধানের চেষ্টা করতে পারব।'